হারানো অতীত

বিবেকানন্দের ভগিনীবৃন্দ : নতুন তথ্যাবলি

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বাশ্রমের বিবরণ তাঁর প্রচলিত জীবনীগ্রন্থগুলিতে অপ্রতুল। কিন্তু এই মহামানবের পরিবার-পরিজনদের পরিচয় জানার অদম্য কৌতূহলে ভক্তহৃদয় ভরপুর। বিপুল আগ্রহ থাকলেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোকপাত করা দুঃসাধ্য, কারণ ইতিমধ্যে অনেকখানি সময় বয়ে গিয়েছে। নির্ভরযোগ্য তথ্যদাতারও অভাব। তারই মধ্যে বেশ কয়েক বছরের পরিশ্রম ও অন্বেষণে যে-তথ্য সংগ্রহ করেছি তারই আলোকে স্বামীজীর ভগিনীগণের বিবরণ উপস্থাপন করলাম।

স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে পাওয়া যায় বিশ্বনাথ দত্ত ও ভুবনেশ্বরী দেবী দশ সন্তানের জনক-জননী ছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, ''আমার পিতার চার পুত্র ও ছয় কন্যা। প্রথম সন্তান ছিল পুত্র। কিন্তু আটমাস বয়সেই সেই শিশুটির মৃত্যু হয়। মা বলতেন, 'আমার ঐ ছেলেটি দেখতে খুব সুন্দর ছিল, অনেকটা তার ঠাকুরদার মত।' এর পরে যে কন্যা সন্তান জন্মে তারও মৃত্যু হয় মাত্র আড়াই বৎসর বয়সে। তার পরে জন্মে এক কন্যা, তার নাম রাখা হয় হীরামণি। হীরামণির পরে স্বর্ণময়ী। তার পরে জন্মায় নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথের পর যে কন্যা সন্তান জন্মায় তারও মৃত্যু হয় বছর ছয়েক বয়সে। এর পর জন্মাল কিরণবালা ও যোগেন্দ্রবালা নামে আরও দুই কন্যা। এই কন্যাদ্বয়ের পর পুত্রসন্তান মহেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁর অনুজ হলাম আমি,

স্বামীজীর দুই দিদি, দুই বোন। নরেন্দ্র-সান্নিধ্যের মধুস্মৃতি মাখানো তাঁদের শৈশব। তাঁদের তিনজনেরই জীবন রহস্যে মোড়া, বেদনায় মূক। প্রখ্যাত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গবেষকের বহু বছরের প্রচেষ্টায় অবশেষে যবনিকা সরল এতদিনের অজানা ইতিহাসের মুখ থেকে। বিশ্বাচার্যের ঘরের কাহিনি বড় মর্মন্তুদ। যুগসূর্যের ঘরেই যুগযন্ত্রণার জমাটবাঁধা অন্ধকার।

ভূপেন্দ্রনাথ। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর শনিবার আমার জন্ম।"[১] মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দের বাল্য জীবনী' গ্রন্থে হীরামণির পরিবর্তে হারামণি নাম উল্লেখ করেছেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজের 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডেও হরমোহিনী বা হারামণি নাম পাই। আমরা এই প্রবন্ধে হারামণি নামই উল্লেখ করব।

ভূপেন্দ্রনাথের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, শৈশব-মৃত্যুর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে বেঁচেছিলেন তিন ভাই ও চার বোন। তিন ভাই নরেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথের পরিচয় সবার জানা। কিন্তু চার ভগিনী হারামণি, স্বর্ণময়ী, কিরণবালা ও যোগেন্দ্রবালার জীবন রহস্যে ঢাকা। এই চার ভগিনীর দুজন শ্বশুরবাড়িতে আত্মহত্যা করেন। সাহিত্যিক শংকর লিখেছেন, ''পিতৃদেব বিশ্বনাথ দত্তর আকস্মিক প্রয়াণের সময় কন্যারা বিবাহিত কি না তাও আমাদের কাছে যথেষ্ট পরিষ্কার নয়।... পরবর্তীসময়ে এদের বিবাহে কে কী ভূমিকা গ্রহণ করলেন, কোথা থেকে বিবাহের অর্থ এলো তাও অস্পষ্ট। আরও যা আলো-আঁধারিতে ভরা, তা হলো একজন নয়, দুই বোনের নিতান্ত অল্পবয়সে স্বামীগৃহে দুঃখজনক অকালমৃত্যু। এঁদের একজন যে ছোটবোন যোগীন্দ্রবালা তা জানা যায়, তিনি যে কলকাতা সিমলা অঞ্চল থেকে সুদূর সিমলা পাহাড়ের পতিগৃহে আত্মঘাতিনী হন তাও স্পষ্ট, কিন্তু দ্বিতীয় আত্মঘাতিনী ভগ্নীর প্রকৃত বিবরণ এখনও রহস্যময়।"[২]

লেখক তাঁর অপর এক গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, ''বলরাম বাবুর বাড়িতে যোগেন মহারাজকে স্বামীজি একবার বলেছিলেন, 'আমাদের এত বুদ্ধি মেধা কেন জানিস? আমরা যে সুইসাইডের বংশ। আমাদের বংশে অনেকগুলো আত্মহত্যা করেছে।... আমাদের পাগলাটে ধাত, হিসেব-নিকেশের ধার ধারে না। যা করবার তা একটা করে দিলুম, লাগে তাক, না লাগে তুক।"[৩]

স্বামীজীর চার ভগিনীর মধ্যে স্বর্ণময়ীর কথা স্বামীজীর জীবনীপাঠকের জানা। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের সংবাদ সিমলার বাড়িতে পৌঁছলে ভুবনেশ্বরী দেবী স্বর্ণময়ীর জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রজমোহন ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে বেলুড় মঠে উপস্থিত হন তাঁর সন্ন্যাসী পুত্রকে শেষ দর্শনের জন্য।[৪] স্বর্ণময়ীর মৃত্যু বাহাত্তর বছর বয়সে, বার্ধক্যজনিত রোগে।

স্বর্ণময়ী দেবীর পৌত্র সমীর ঘোষের (২০১৭ সালে ৭৪ বছর বয়স্ক) বিবৃত তথ্য থেকে জানা যায় যে, হারামণি, স্বর্ণময়ী, কিরণবালা ও যোগেন্দ্রবালার শ্বশুরবাড়ি ছিল যথাক্রমে খড়িয়প গ্রাম (হাওড়া), জোড়াসাঁকো (কলকাতা), সোনারপুর (চব্বিশ পরগণা) এবং পানিহাটি গ্রামে (চব্বিশ পরগণা)। স্বামীজীর তৃতীয় ভগিনী কিরণবালা বিবাহের দীর্ঘকাল পর আঠারো বছর বয়সে একমাত্র সন্তান যতীন্দ্রনাথের জন্ম দিয়ে ধরাধাম ত্যাগ করেন। প্রসূতিগৃহেই তাঁর মৃত্যু হয়। চতুর্থ ভগিনী যোগেন্দ্রবালা সিমলা পাহাড়ে সরকারি আবাসনকক্ষে গলায় কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। এই আত্মহত্যার কথা স্বামীজীর সকল জীবনীগ্রন্থে বিবৃত। অবশিষ্ট থাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনী হারামণির মৃত্যুপ্রসঙ্গ। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের বংশধর রতন ভট্টাচার্য মহাশয় প্রণীত '*স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষে হাওড়া জেলা তথা আমতা*' পুস্তিকায় উল্লেখ আছে : ''স্বামীজীর যে ভগ্নীর বিবাহ হয়েছিল হাওড়া জেলার আমতার নিকট খড়িয়প গ্রামে বোসেদের বাড়িতে, তিনি এক কন্যা সন্তানের জননী হওয়ার পর আত্মহত্যা করেছিলেন। বোসবাড়ির তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে তিনি কলকে বীজ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। কিন্তু গ্রামের লোকেরা বলে সেই বউকে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছিল এবং তাঁর দেহ জমিদারদের নাচঘরের বাগানের কোনও এক স্থানে পুঁতে রাখা হয়েছে।"[৫]

স্বামীজীর এই ভগিনী অবশ্যই হারামণি। কারণ অন্য ভগিনীদের কারোরই শ্বশুরবাড়ি খড়িয়প গ্রামে নয় এবং আর কেউই জমিদারবাড়ির বধূ হননি।

হারামণি

স্বামীজীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী হারামণি। হারামণি সংক্রান্ত সব তথ্যই জানা যায় বসু বংশের অধস্তন পুরুষ রমেন্দ্র বসুর (২০১২ সালে ৯০ বছরের প্রবীণ) কাছ থেকে এবং রতন ভট্টাচার্য প্রণীত পূর্বোক্ত পুস্তিকা থেকে। মনে হয় আগের দুই ভাইবোনের অকালমৃত্যুর জন্য হারামণির এই নামকরণ। জন্ম ১৮৫৮ সালে। শৈশবে তিনি বেথুন কলেজিয়েট স্কুলে পড়েন। সূচিশিল্পেও তিনি পারদর্শিনী ছিলেন। বাড়ির জ্যেষ্ঠ সন্তান বলে সকলের কাছ থেকেই স্নেহ-আদর পেতেন। হারামণির দশ বছর বয়স হলে পিতা নানা স্থানে উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করেন। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন থাকতেন শ্যামবাজারের ফড়িয়াপুকুর অঞ্চলে। সেখানে বিশ্বনাথ দত্তের এক নিকট আত্মীয়ও থাকতেন। তাঁর বাড়িতে যাতায়াতের সুবাদে বিশ্বনাথের সঙ্গে মহেশচন্দ্রের আলাপ ও সখ্য হয়। একদিন বিশ্বনাথ কথাপ্রসঙ্গে মহেশচন্দ্রের কাছে হারামণির জন্য পাত্রের সন্ধান চাইলে মহেশচন্দ্র জানান, আমতার কাছে খড়িয়প গ্রামের জমিদার সূর্যকুমার বসু এবং তাঁর পুত্র মাখনগোপাল তাঁর ছাত্র। মাখনগোপাল সুদর্শন ও সুউপায়ী, কলকাতার এক সওদাগরি অফিসে কর্মরত। এরপর বিশ্বনাথ খড়িয়প গ্রামে গিয়ে সূর্যকুমারের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ প্রসঙ্গ আলোচনা করেন এবং মহেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সখ্যের কথাও জানান। মহেশচন্দ্রের পিতা বসু পরিবারের কুলগুরু। তাই সূর্যকুমার বিশ্বনাথ দত্তকে যথেষ্ট আপ্যায়ন করেন এবং নিজ পুত্রের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহে সম্মত হন।

১৮৬৮ সালে মাখনগোপাল ও হারামণির বিবাহ হয়। সেইসময় হারামণির বয়স দশ এবং মাখনগোপালের আঠারো। হারামণি বসু পরিবারে বধূ হয়ে এলেন। তাঁর জীবন খুব সুখেই কাটছিল। সতেরো বছর বয়সে ১৮৭৫ সালে তিনি এক কন্যার জন্ম দেন। তার নাম হয় শিবকালী। হারামণির কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদে সিমলার দত্তবাড়িতে আনন্দের জোয়ার বইলেও শ্বশুরবাড়িতে নিরানন্দের হাওয়া। প্রথম সন্তান কন্যা হওয়ায় বাড়ির লোকজন হারামণিকে অলক্ষণারূপে চিহ্নিত করেছিল। মাখনগোপালও মুখ ফেরালেন।

কর্মসূত্রে মাখনগোপাল কলকাতায় থাকতেন বলে প্রায়ই সিমলায় শ্বশুরবাড়ি যেতেন। বিশ্বনাথের জ্ঞাতিভাই তারকনাথের গৃহে যাতায়াত ছিল তাঁর। সেইসময় তারকনাথের তৃতীয়া কন্যা হরসুন্দরী বিবাহযোগ্যা। তিনি সুন্দরী ছিলেন। মাখনগোপালের ইচ্ছা হল তাঁকে বিবাহ করার। তিনি সে-ইচ্ছার কথা তারকনাথের স্ত্রী জ্ঞানদাসুন্দরীকে জানালেন। প্রথমে তাঁরা এ-প্রস্তাবে সম্মতি না জানালেও অখুশি হননি। এ-সংবাদ হারামণির কানে গেলে তিনি তীব্র আপত্তি জানান। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হয়। একদিন সন্ধ্যাবেলা হারামণি বেশ কয়েকটি কলকে ফল খেয়ে মৃত্যুবরণ করলেন (১৮৮০)। কিন্তু জনশ্রুতি, তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছিল এবং তাঁর মৃতদেহ বসুদের নাচঘরের বাগানের কোথাও পুঁতে রাখা হয়েছে। মৃত্যুর দুদিন পর হারামণির মৃত্যুসংবাদ সিমলায় জানানো হলে খড়িয়প গ্রামে ছুটে এসেছিলেন নরেন্দ্রনাথ। স্বর্ণময়ী দেবীর পৌত্র সমীর ঘোষ জানিয়েছেন, তখন শিবকালীর বয়স পাঁচ বছর। নরেন্দ্রনাথ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সিমলায় ফেরেন।

হারামণির মৃত্যুর কয়েকমাস পরই মাখনগোপাল হরসুন্দরীকে বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁদের সন্তানাদি হয়নি। শিবকালী মাতুলালয়েই বড় হয়ে ওঠেন।

ভুবনেশ্বরীর ব্যবস্থাপনায় চুঁচুড়ার দত্ত পরিবারে তাঁর বিবাহ হয়। স্বামী সরকারি চাকরি করতেন। শিবকালীর এক কন্যা বিমলা ও এক পুত্র মণিলাল। বিমলার বিবাহ হয়েছিল হাওড়ার শালিকা বা সালকিয়ায়। তাঁর দুই কন্যা—অনুপমা ও নিরুপমা। সিমলার দত্ত পরিবারের শেষ প্রতিনিধি ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে হারামণির তৃতীয় প্রজন্মেরও যোগাযোগ অব্যাহত ছিল।

পরবর্তী কালে সরকারি হস্তক্ষেপে জমিদারি স্বত্ব লোপের সময় বসু পরিবার সিদ্ধান্ত নেন—নাচঘর, বাগানবাড়ি, বেড়পুকুর ও তার সংলগ্ন ভূখণ্ড রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করবেন। এই মর্মে আবেদনপত্রও পাঠানো হয়। কিন্তু মিশন কর্তৃপক্ষ এ-ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেননি। ওই স্থান 'শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমবিহার' আশ্রম কর্তৃপক্ষকে দান করে দেওয়া হয় ১৯৯৫ সালে[৬]। বর্তমানে সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির, বাগান, বিদ্যালয়, পাঠাগার গড়ে উঠেছে। স্থানীয় অধিবাসীরা ঠাকুর, মা ও স্বামীজীকে অনুধ্যানের সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হয়েছেন। স্বামীজীর পদার্পণধন্য স্থান যে কত পবিত্র, হারামণির মৃত্যুর শতবর্ষ পরে খড়িয়প গ্রামে প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমবিহার' আশ্রম প্রতিষ্ঠার মধ্যেই সে-সত্য প্রমাণিত হয়।

স্বর্ণময়ী

স্বামীজীর দ্বিতীয় ভগিনী স্বর্ণময়ীর জন্ম ১৮৬০ সালে। তিনি বেথুন কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশোনা করেন। তাঁর সম্পর্কে জানা গিয়েছে তাঁর পৌত্র সমীর ঘোষের কাছ থেকে। দশ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় জোড়াসাঁকোর (বলরাম দে স্ট্রিট) হরিমোহন ঘোষের (১৮৪৫—১৯০৫) সঙ্গে। তাঁদের আদিবাড়ি ছিল ছাতুবাবুর বাজারের উলটো দিকে। হরিমোহন ও স্বর্ণময়ীর নয় সন্তান। চার কন্যা—রাজলক্ষ্মী, সরস্বতী, যদুমণি ও বসুমতী এবং পাঁচ পুত্র—ব্রজমোহন, নীলমণি, সুরেন্দ্রনাথ, গোপালকৃষ্ণ ও কানাইলাল। ব্রজমোহন আশৈশব মাতুলালয়ে থাকতেন। হরিমোহনের ব্যবসা ছিল এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ম্ভর ছিলেন বলেই মনে হয়। সমীর ঘোষ (গোপালকৃষ্ণের পুত্র) বংশের প্রবীণদের মুখে শুনেছেন, স্বর্ণময়ী দেবী প্রতিমাসে বাড়িতে সত্যনারায়ণ ব্রতকথার অনুষ্ঠান করতেন এবং পাড়ার সকলকে সত্যনারায়ণের পাঁচালি শোনার জন্য নিমন্ত্রণ জানাতেন। অতিথিদের বসিয়ে প্রসাদ খাওয়াতেন। দুঃস্থ অনাথাদের প্রতি তাঁর অনুকম্পা ছিল অধিক। প্রতিমাসে গঙ্গাস্নানে গিয়ে সাধু ও ভিখারিদের নিয়মিত অর্থদান করতেন। তিনি বলতেন, ''সাধু ও ভিখারিদের অর্থ দিলে গৃহে লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পড়ে।''

ভুবনেশ্বরী দেবীর সকল প্রয়োজনেই স্বর্ণময়ী ও তাঁর পুত্ররা সদা সচেষ্ট থাকতেন। ১৯০১ সালে স্বামীজী যখন তাঁর মাকে নিয়ে পূর্ববঙ্গে চন্দ্রনাথ তীর্থদর্শনে ও আসামে কামাখ্যাদর্শনে যান তখন স্বর্ণময়ী দেবী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। স্বামীজী শুক্তো ও কই মাছের ঝাল খেতে ভালবাসতেন। যখন স্বামীজী বেলুড় মঠে থাকতেন, স্বর্ণময়ীর পুত্ররা প্রায়ই ওইসমস্ত জিনিস নিয়ে মঠে যেতেন। স্বামীজীর দিদি পাঠিয়েছেন বলে সাধুরা আনন্দ করে খেতেন। প্রতিবছর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের আগে স্বর্ণময়ী বেলুড় মঠে প্রণামী দিতেন এবং যতদিন জীবিত ছিলেন প্রায় প্রতিবছর উৎসবে উপস্থিত থাকতেন।

স্বর্ণময়ীর পর তাঁর একটি বোন জন্মালেও সে শৈশবেই মারা যায়। সেই কারণে স্বর্ণময়ী বলতেন, ''নরেন আমার কোলের ভাই'' অর্থাৎ আমার পরই নরেন। দেবদ্বিজে বিশ্বাসী, ন্যায়পরায়ণা, মৃদুভাষিণী স্বর্ণময়ী ১৯৩২ সালে বাহাত্তর বছর বয়সে পুত্রকন্যা এবং নাতি-নাতনিদের রেখে অমরধামে যাত্রা করেন।

কিরণবালা

স্বামীজীর তৃতীয় ভগিনী কিরণবালার কথা জানা যায় তাঁর পৌত্র প্রতাপচন্দ্র বসুর (২০১৪ সালে ৮৪ বছরের প্রবীণ) কাছ থেকে। কিরণবালার জন্ম ১৮৬৫ সালে। তিনি আমবাগানের মিশন স্কুলে পড়াশোনা করতেন। নরেন্দ্রনাথের পরই জন্ম বলে তিনি তাঁর খুব স্নেহের পাত্রী ছিলেন। নরেন মাঝে মাঝে এই বোনটিকে খুব রাগাতেন, তাঁকে নিয়ে নানা মজাও করতেন। কিরণবালার ভাল গানের গলা ছিল। পাড়ার যে-কোনও অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্য তাঁর ডাক পড়ত। হাইকোর্টের বড়বাবু, সোনারপুর-নিবাসী হরিশচন্দ্র বসু ছিলেন বিশ্বনাথ দত্তের পরিচিত। কথাপ্রসঙ্গে বিশ্বনাথ দত্ত জানতে পারেন, হরিশবাবু ভাইপোর জন্য সুপাত্রী খুঁজছেন। তাঁর ভাইপো গোপাল বসু একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শৈশবেই পিতৃহীন গোপাল হরিশবাবুর কাছে মানুষ হয়েছিলেন। বিশ্বনাথ দত্ত পাত্রকে দেখেন এবং তাঁর সঙ্গে কিরণবালার বিবাহ স্থির করেন।

১৮৭৪ সালে কিরণবালার সঙ্গে গোপালচন্দ্রের বিবাহ হয়। তখন কিরণবালার বয়স নয় এবং গোপালচন্দ্রের উনিশ। দীর্ঘকাল কিরণবালার সন্তানাদি হয়নি। সে-কারণে তাঁকে আত্মীয়-পরিজন ও প্রতিবেশীদের গঞ্জনা শুনতে হত যথেষ্ট। বাড়ির লোকেরা কোনও শুভ কাজে তাঁকে ডাকতেন না। সন্তানহীনতার গঞ্জনা এবং অপত্যস্নেহ-বঞ্চিতা হয়ে খুবই মনঃকষ্টে দিন কাটাতেন তিনি। অন্যমনস্কতা, বিস্মৃতি, নিদ্রাহীনতা—এমন নানারোগের শিকার হয়েছিলেন। গোপালচন্দ্র চিকিৎসকের পরামর্শে এক অনাথ বালিকার প্রতিপালনের ভার দেন তাঁকে। এক বছরের সেই শিশুকন্যাকে সম্বল করে কিরণবালা আবার সুস্থজীবন লাভ করেন। অন্নপূর্ণা নাম্নী সেই কন্যা যখন তিন বছরের তখন কিরণবালা গর্ভবতী হন। ১৮৮৩ সালে এক পুত্রসন্তান প্রসবের পর তাঁর আর জ্ঞান ফেরেনি। আমরা জানি না, কিরণবালা জেনে গিয়েছিলেন কি না, তিনি পুত্রসন্তানের জননী হলেন।

কিরণবালার পুত্রের নাম যতীন্দ্রনাথ। তিনি জীবনের অধিক সময় অতিবাহিত করেছেন সিমলায় দিদিমার কাছে। যতীন্দ্রনাথ মহেন্দ্রনাথ দত্তের মুখে কিরণবালা সম্পর্কে একটি ঘটনা শুনেছিলেন। কিরণবালা তখন বেশ অসুস্থ। গোপাল বসু তাঁকে সিমলায় তাঁর মায়ের কাছে রেখে গেছেন। এমন সময় একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের গৃহে পদার্পণ করেছেন। তিনি দিব্যভাবে বিভোর, উবু হয়ে বসে। পরনের কাপড় বগলে টিপে ধরে আছেন। একটু স্বাভাবিক হলে ভুবনেশ্বরী কিরণবালাকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, ''ঠাকুর, এ খুব মনঃকষ্টে আছে। সন্তানাদি যাতে হয়—একটু কৃপা করুন।'' কিরণবালা ঠাকুরের শ্রীচরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলেন। হঠাৎ ঠাকুর লাফিয়ে উঠে বলতে থাকেন, ''এ কী হল মা! জয় মা! জয় মা! সব হবে! ভাবিস না কিছু। সব হবে।'' তখন সকলে ভেবেছিল পাগলের প্রলাপ। কিন্তু সবই ঠিক। শ্রীরামকৃষ্ণ লাফিয়ে উঠেছিলেন কিরণবালার নিকট মৃত্যু জানতে পেরে; আর তিনি সন্তানের জননী হবেন তাও জানতে পেরে বলেছিলেন ''সব হবে।'' যদিও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন তিনি ষোলো বছর জীবিত ছিলেন, কিন্তু কিরণবালার বংশধররা বলেন আঠারো বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কারণ যতীন্দ্রনাথের জন্মবর্ষ ১৮৮৩।

যোগেন্দ্রবালা

স্বামীজীর সর্বকনিষ্ঠা ভগিনী যোগেন্দ্রবালা। জন্ম ১৮৬৭ সালে। তাঁর পরে মহেন্দ্রনাথ ১৮৬৯ ও ভূপেন্দ্রনাথ ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। যোগেন্দ্রবালা সকল ভ্রাতাদেরই স্নেহের নিধি

ছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ যোগেন্দ্রবালা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, ''আমাদের পরিবারের মেয়েরা 'হিন্দু মহামেলায়' হস্তশিল্পের কাজও পাঠাতেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ইয়ুর্বার্ট প্রদর্শনী অনুষ্ঠানকালে আমাদের ভগিনীদের মধ্যে কনিষ্ঠা যোগেন্দ্রবালা সেখানে একটি পুঁতির মালা পাঠিয়ে পদক পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিস্ কামিনী শীলের কাছে ইংরেজীও শিখতেন। অধ্যাপক ম্যাকডোনাল্ডের পত্নী শ্রীমতী ম্যাকডোনাল্ডও তাঁকে পড়াতে আসতেন।''[৭]

সেকালের নিয়মানুসারে পড়াশোনায় বেশিদূর অগ্রসর হতে না পারলেও গৃহে নিয়মিত বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থ পড়তেন যোগেন্দ্রবালা। তাঁর বয়স যখন দশ, তখন থেকেই বিশ্বনাথ উপযুক্ত পাত্রের অন্বেষণ করছিলেন। বিভিন্ন স্থান থেকে পাত্রের সংবাদ আসতে থাকলেও পিতা কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। প্রায় এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল, যোগেন্দ্রবালা একাদশ বর্ষে পা দিলেন। ভুবনেশ্বরী চিন্তিত হয়ে বিশ্বনাথকে বিশেষ তাগাদা দিতে লাগলেন। আকস্মিকভাবেই পানিহাটির মিত্রবাড়ির এক পাত্রের সন্ধান আনলেন ঘটক। পাত্র রামচন্দ্র মিত্র, তিনি কেদারনাথ মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি উচ্চশিক্ষিত এবং ব্রিটিশ সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টের অফিসার। বিশ্বনাথ পানিহাটি গিয়ে পাত্র দেখে সন্তুষ্ট হলেন। ১৮৭৮ সালে যোগেন্দ্রবালা ও রামচন্দ্রের বিবাহ হল। সেসময় রামচন্দ্রের বয়স উনিশ এবং যোগেন্দ্রবালার এগারো। যেহেতু রামচন্দ্র সরকারি কর্মচারী ছিলেন, তাই প্রায়শই তাঁকে দিল্লি, চণ্ডীগড়, করাচি, পাটনা, পুনা, সিমলা প্রভৃতি স্থানে বদলি হতে হত।

১৮৮৩ সালে চণ্ডীগড়ে তাঁদের প্রথম কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। পুনাতে থাকাকালে ১৮৮৬ সালে তাঁদের দ্বিতীয় কন্যার জন্ম হয়। এদের নাম যথাক্রমে চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখী।

যোগেন্দ্রবালা ছিলেন দৃঢ়চেতা। সহজে কোনও কিছু মেনে নিতেন না। রামচন্দ্র ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন বলে শহরে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধিদের অনুষ্ঠানে তাঁকে প্রায়শই অংশ নিতে হত। যোগেন্দ্রবালাও নিমন্ত্রিত হতেন। প্রথম প্রথম দু-একটি অনুষ্ঠানে তিনি গেলেও পরে আর যেতেন না। সকলের কাছে রামচন্দ্রকে স্ত্রীর অনুপস্থিতির কারণ বলতে হত। এভাবেই স্বামী-স্ত্রীর চিন্তা-চেতনায় পার্থক্য দেখা দেয়। মদ্যপান যোগেন্দ্রবালা মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। ফলে তাঁদের মধ্যে অশান্তি শুরু হল। ১৮৯০ সালে যখন তাঁরা সিমলা পাহাড়ে তখন একদিন সেই অশান্তির আগুন এমনই তীব্র হল যে, যোগেন্দ্রবালা সরকারি আবাসনের রান্নাঘরে গলায় কাপড়ের ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। তখন চন্দ্রমুখী সাত এবং পদ্মমুখী চার বছরের। যোগেন্দ্রবালার মৃত্যুসংবাদ কলকাতায় পৌঁছলে মহেন্দ্রনাথ আলমবাজার মঠে গিয়ে সাধুদের সে-সংবাদ জানান। স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দ তখন আলমোড়ায়। মঠের সাধুরা সিদ্ধান্ত নিলেন, স্বামী সারদানন্দকে সংবাদটি জানালে, তিনি স্বামীজীকে বুঝিয়ে কলকাতায় পাঠাতে পারেন। কারণ ভুবনেশ্বরী দেবী শোকে মাঝেমাঝেই মূর্ছা যাচ্ছিলেন। শশী মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, নিরঞ্জন মহারাজ, যোগেন মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ প্রমুখের পরামর্শক্রমে মহেন্দ্রনাথ হাওড়া স্টেশনে গিয়ে আলমোড়ার ঠিকানায় (লালা বদ্রি শা-র বাড়িতে) তার করেন। পরে যোগেন মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের গৃহে এসে শোকজর্জর জননীকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করেন।[৮] আলমোড়ায় স্বামীজী খুব আনন্দেই ছিলেন। দুঃসংবাদ পেয়ে ''স্বামীজীর স্বভাবত স্নেহপ্রবণ মন দুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়িল। আবার এই অতি বিষাদময় বিবরণের মাধ্যমে ভারতীয় নারীজীবনের বেদনাপূর্ণ দিকটার

একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণও তিনি পাইলেন এবং ইহার প্রতিকারের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।"[৯]

যোগেন্দ্রবালার মৃত্যুর কয়েকমাস পরেই নাবালিকা কন্যাদের দেখাশোনার তাগিদে রামচন্দ্র পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আমোদিনী দেবী, গিরিশচন্দ্র রুদ্রের কন্যা। তাঁর নিবাস ছিল হুগলির মাহেশে। স্ত্রীবিয়োগ হলে রামচন্দ্র কন্যাদের মাতুলগৃহে আসতে দেননি। তারা বিমাতার কাছেই থাকত। চব্বিশ পরগণা জেলার আড়বালিয়া গ্রামের বাসিন্দা যোগেশচন্দ্র নাগচৌধুরীর সঙ্গে চন্দ্রমুখীর এবং কালীঘাটের বাসিন্দা কিরণচন্দ্র দে-র সঙ্গে পদ্মমুখীর বিবাহ হয়। রামচন্দ্রের দ্বিতীয়পক্ষের দুই কন্যা—সলিলাবালা ও সুশীলাবালা; দুই পুত্র—সাতকড়ি ও শিশির। সলিলাবালার বিবাহ হয় বরিশালের দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে। তাঁদের একটি কন্যা—নাম শান্তি। স্বাধীনতা সংগ্রামী শান্তি নিজের পরিচয় দিতেন এই বলে যে, তিনি স্বামীজীর নাতনি।

সাতকড়ি উচ্চশিক্ষা লাভ করে বঙ্গবাসী কলেজে নৃবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। তিনি অকৃতদার, সমাজসেবী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তিনি পানিহাটি এলাকার বিধায়ক নির্বাচিত হন। শিশির উচ্চশিক্ষা লাভ করে সরকারি চাকুরি করতেন। তিনি দুবার পানিহাটি পৌরসভার চেয়ারম্যান হন। রামচন্দ্র প্রয়াত হন ১৯০৬ সালে।

সবচেয়ে বিচিত্র বিষয় হল, ভুবনেশ্বরী দেবী কন্যাকে হারালেন। নাতনিরা যেহেতু পিতার তত্ত্বাবধানে রইল, তাঁকে লোক মারফত তাদের খোঁজখবর নিতে হত। জামাতাও দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী, পুত্রকন্যাদের নিয়ে ভুবনেশ্বরীর কাছে আসতেন। নিরুপায়, অসীমধৈর্যশীলা ভুবনেশ্বরীকে তাদের আপ্যায়ন করতে হত যথাযথভাবে। আমোদিনী দেবীকেও তিনি নিজের কন্যার মতোই দেখতেন এবং যোগেন্দ্রবালার দুই কন্যার সঙ্গে আমোদিনীর তিন সন্তানও তাঁকে দিদিমা সম্বোধনে ডাকলে তাদের সকলের জন্য হৃদয়ের ভালবাসা উজাড় করে দিতেন। ভাবতে বিস্ময় লাগে, আমোদিনীর পুত্র সাতকড়ির শিক্ষা, চিন্তা-চেতনা, সমাজসেবা, রাজনীতি—সবেতেই স্বামীজী, মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল। তিনি সিমলাতে মহেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যেই জীবনের মুখ্য সময় অতিবাহিত করেছেন। রামচন্দ্রের তৃতীয় প্রজন্মের সকলের সঙ্গে স্বামীজীর ভাইদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বরাবর বজায় ছিল।

রামচন্দ্রের পৌত্র অলোক মিত্রের (২০১৭ সালে ৬৮ বছর বয়স্ক) কাছ থেকে যোগেন্দ্রবালা সম্বন্ধে তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। তিনি সাতকড়ি মিত্র মহাশয়ের কাছে শুনেছেন, তাঁদের পানিহাটির বাড়িতে বিশ্বনাথ দত্ত ও নরেন্দ্রনাথ একাধিকবার পদার্পণ করেছেন। স্বামীজী আমেরিকা থেকে রামচন্দ্রকে পত্র দেন, তাতে যোগেন্দ্রবালার কন্যাদের পড়াশোনায় উৎসাহ দিয়েছিলেন।

সাতকড়ি মিত্রের ডায়েরি থেকে যোগেন্দ্রবালার শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যের কথা জানা যায় : ''ঠাকুর একবার সিমলায় নরেন্দ্রনাথের গৃহে গেছেন এবং কীর্তনানন্দে মশগুল আছেন। হঠাৎ তিনি ভাবস্থ হন। তখন সকলে পাখা-পাখা বলে চিৎকার করতে থাকলে ভুবনেশ্বরী দেবী একটি তালপাখা যোগেন্দ্রবালার হাতে দিয়ে বলেন, 'যা, তুই নিজে গিয়ে ঠাকুরকে বাতাস কর।' মায়ের নির্দেশমতো তিনি ঠাকুরকে পাখার বাতাস দিতে থাকলে ভক্তগণ তাঁকে স্থান করে দেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর ভাবসমাধি ভঙ্গ হলে তিনি যোগেন্দ্রবালার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'মা, তোর যে যোগীর চোখ, সব পাপ ক্ষয় করে এনেছিস। একটু জল দিতে পারিস মা?' যোগেন্দ্রবালা সত্বর অন্দরে প্রবেশ করে একটি পাথরের গ্লাসে জল নিয়ে গিয়ে ঠাকুরের হাতে

দেন। ঠাকুর গ্লাসটি ধরে একটু চুমুক দিলেন। ঠাকুরের হাত থেকে গ্লাসটি নিয়ে তিনি চলে এলেন। অনুষ্ঠানশেষে সকলে ঠাকুরকে প্রণাম জানালে যোগেন্দ্রবালাও তাঁর চরণে প্রণিপাত জানান। যে মুহূর্তে তিনি ঠাকুরের পাদস্পর্শ করেছিলেন সেই মুহূর্তে তাঁর শরীরে এক অপূর্ব শিহরণের প্রবাহ বয়ে গিয়েছিল।"

উপসংহার

স্বামীজীর ভগিনীদের জীবনের যে-সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া গেল তাতে বোঝা যায় স্বামীজীর পিতা তাঁর জীবদ্দশায় কন্যাদের বিবাহ সম্পন্ন করে গিয়েছেন। এমনকী তিনি জীবৎকালেই বিবাহিত দুই কন্যার অকালমৃত্যুও দেখেছেন। এ-যাবৎ অপ্রকাশিত এ-কাহিনির আগাগোড়া মৃত্যুর মিছিল; কিন্তু আখ্যানের নায়িকারা বিবেকানন্দের বোন—তাই জীবন দিয়েও তাঁরা অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে গেছেন। সে-সত্য বড়ই উজ্জ্বল। তাঁদের চরণে প্রণতি জানাই।

সেইসঙ্গে আরও একটি বিস্ময়কর চরিত্র অবলোকনের সুযোগ আমরা পাই—তিনি অসীম ধৈর্যের অধিকারিণী, ধরিত্রীসমা, বিশাল হৃদয়ের এক জননী—ভুবনেশ্বরী দেবী। স্বামীর অকালমৃত্যু, জ্ঞাতিদের অন্যায় মামলা, ভিটাচ্যুতি, সাধনলব্ধ প্রিয় পুত্রের সন্ন্যাসগ্রহণ ও মৃত্যু, অভাব-অনটনের দুর্বার অভিশাপ, চার কন্যার মধ্যে তিনজনের অকালমৃত্যু—তাও দুজনের আত্মহত্যা—এসবই তিনি নীরবে সহ্য করেছেন। মৃত কন্যাদের সন্তানদের নিজের কাছে রেখে বড় করেছেন; মৃত কন্যার সপত্নী ও তার পুত্রকন্যাদের আপন জ্ঞান করে কাছে টেনে নিয়েছেন। বিশ্বসংসারে এ-চরিত্রের নমুনা মেলা ভার। যথার্থই তিনি বিশ্ববরেণ্য বিবেকানন্দের গরীয়সী জননী! তাঁরও শ্রীচরণে আমাদের প্রাণের প্রণাম। ✠

তথ্যসূত্র

১। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *স্বামী বিবেকানন্দ* (নবভারত পাবলিশার্স : কলকাতা, ১৪০০) পৃঃ ৯৪ [এরপর, *স্বামী বিবেকানন্দ*]

২। শংকর, *অবিশ্বাস্য বিবেকানন্দ* (সাহিত্যম্ : কলকাতা, ২০১২), পৃঃ ৩৩

৩। শংকর, *অচেনা অজানা বিবেকানন্দ* (সাহিত্যম্ : কলকাতা, ১৪১০), পৃঃ ৫৮

৪। *স্বামী বিবেকানন্দ*, পৃঃ ৯০

৫। রতন ভট্টাচার্য, *স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষে হাওড়া জেলা তথা আমতা*, ২০১২, পৃঃ ৩ [এরপর, *সার্ধশতবর্ষে হাওড়া*]

৬। *সার্ধশতবর্ষে হাওড়া*, পৃঃ ৪

৭। *স্বামী বিবেকানন্দ*, পৃঃ ৯৬

৮। দ্রঃ মহেন্দ্রনাথ দত্ত, *শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী* (দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি : কলকাতা, ২০০৭) খণ্ড ১, পৃঃ ১৭১-৭২

৯। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০১) খণ্ড ১, পৃঃ ২৩২